কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 18 JUN 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ১৪ ... কলাম ... ৩ ...

হারুন-অর-রশিদ ▷

বিজ্ঞান শিক্ষায় অনীহার সমাধান খুঁজতে হবে

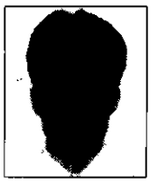

আনন্দময় পরিবেশে বিজ্ঞান শেখানোর মতো দক্ষ শিক্ষকের বড়ই অভাব। প্রচলিত নিম্ন সামাজিক মর্যাদা আর স্বল্প আর্থিক সুবিধার কারণে দক্ষ শিক্ষকদের এ কাজে আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। তবে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে ব্যাপক হারে শিক্ষার্থী সম্মেলন করে কোনো জনপ্রিয় বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিত্বের সঞ্চালনায় মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তাদের বিজ্ঞানমুখী করে তোলা যায়

বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি। তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নজিরবিহীন উন্নতির ফলে গোটা বিশ্ব আজ গ্লোবাল ভিলেজে পরিণত হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বর্তমান বিশ্বের সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের মূল হাতিয়ার। একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুত হতে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্ব পরিমণ্ডলে নিজ অবস্থান সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল করতে বিজ্ঞান শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

বিশ্বায়নের এই যুগে বিশ্ব যখন বিজ্ঞানের কল্যাণে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশে তখন বিজ্ঞান শিক্ষার্থী দিন দিন আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যুরো অব এডুকেশনাল ইনফরমেশন অ্যান্ড স্ট্যাটিসটিক্স (ব্যানবেইস)-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৯৯০ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ছিল মোট শিক্ষার্থীর ৪২.৮১ শতাংশ। ২০১৪ সালে বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী দাঁড়িয়েছে ২৫.০১ শতাংশে। অর্থাৎ পঁচিশ বছরের ব্যবধানে মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ১৭ দশমিক ৮০ শতাংশ। একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও। ১৯৯০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী ছিল মোট শিক্ষার্থীর ২৮.১৩ শতাংশ। ২০১৪ সালে বিজ্ঞান বিভাগের পরীক্ষার্থী দাঁড়িয়েছে ১৭.০৩ শতাংশে। অর্থাৎ পঁচিশ বছরের ব্যবধানে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান শিক্ষার্থীর সংখ্যা কমেছে ১১ দশমিক ১ শতাংশ। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের পরিসংখ্যান হচ্ছে, ১৯৯০ সালে বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী ছিল মোট শিক্ষার্থীর ১৭ শতাংশ আর ২০১৩ সালে যা দাঁড়িয়েছে ১১ শতাংশে।

বিজ্ঞানাগার ও যোগ্য শিক্ষকের অভাবে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের ভিত্তি দুর্বল থেকে যাচ্ছে। মুখস্থ বিদ্যার ওপর ভর করে তারা এসএসসি পার হলেও কলেজ পর্যায়ে এসে সমস্যায় পড়ছে। ফলে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে গিয়ে বিজ্ঞানের অনেক শিক্ষার্থী বিভাগ পরিবর্তন করে মানবিক বা ব্যবসায় শিক্ষা শাখায় চলে যাচ্ছে। নিম্নমুখী এই অব্যাহত প্রবণতা গ্রামের স্কুল-কলেজগুলোতে বেশি প্রকট। কিছু অভিজাত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাড়া শহরের চিত্র অভিন্ন। আর্থিক সংকট, দক্ষ শিক্ষকের অভাব, পর্যাপ্ত ক্লাস না হওয়া, উপযুক্ত বিজ্ঞানাগার না থাকা, পরীক্ষার ফল, শিক্ষক ও অভিভাবকদের প্রভাব, সিলেবাসের মাত্রাতিরিক্ত চাপ, অত্যুচ্চ ব্যয়ভার, কোচিংনির্ভরতা আর কর্মসংস্থানের অনিশ্চয়তাই মূলত বিজ্ঞানের প্রতি অনাগ্রহের প্রধান কারণ। তা ছাড়া স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কিছু গাইড বই ছাড়া মাতৃভাষায় বিজ্ঞানের মৌলিক কোনো বই নেই বললেই চলে। মফস্বলে বিজ্ঞান ও গণিত পড়ানোর মতো শিক্ষক কম। আর বয়স্ক যাঁরা আছেন, তাঁরা যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারছেন না। সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টায় মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু নানা কারণে মাল্টিডাইমেনশনাল শিক্ষককে আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। মাল্টিমিডিয়া ক্লাস পরিচালনার জন্য চাই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞানসম্পন্ন দক্ষ শিক্ষক। কিন্তু শিক্ষকের দক্ষতার অভাবে সরকারের এ প্রচেষ্টার সুফল পাচ্ছে না বেশির ভাগ শিক্ষার্থী।

শিক্ষার্থীদের মাঝে বিজ্ঞানকে উপস্থাপন করতে হবে বিনোদনের বিষয়বস্তু হিসেবে। মুখস্থনির্ভর বিজ্ঞানকে না বলে আনন্দদায়ক বিজ্ঞানচর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের দেখাতে হবে তাত্ত্বিক বিজ্ঞানের সঙ্গে বাস্তবতার মিল কোথায়। যাতে করে তাদের মধ্যে বাল্যকাল থেকেই বিজ্ঞানানুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুঃখজনক হলো, বাস্তবতার সঙ্গে মিল দেখিয়ে আনন্দময় পরিবেশে বিজ্ঞান শেখানোর মতো দক্ষ শিক্ষকের বড়ই অভাব। প্রচলিত নিম্ন সামাজিক মর্যাদা আর স্বল্প আর্থিক সুবিধার কারণে দক্ষ শিক্ষকদের এ কাজে আকৃষ্ট করা যাচ্ছে না। তবে মফস্বলে এমনকি শহরের স্কুল-কলেজগুলোতে কর্তব্যরত শিক্ষকদের দক্ষতা রাতারাতি উন্নত করা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করতে যে কাজটি সহজে করা যেতে পারে, তা হলো ব্যাপক হারে শিক্ষার্থী সম্মেলন করে কোনো জনপ্রিয় বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিত্বের সঞ্চালনায় মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে তাদের বিজ্ঞানমুখী করে তোলা। তাদের মধ্যে সৃষ্টির আগ্রহ সৃষ্টি করা।

ইউনেসকোর সুপারিশ অনুযায়ী, শিক্ষা খাতে একটি দেশের বরাদ্দ হওয়া উচিত নিজ দেশের জিডিপির ৬ শতাংশ অথবা বাজেটের ২০ শতাংশ। পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, ২০১৪-১৫ অর্থবছরে শিক্ষা ও প্রযুক্তি খাতে বাজেট বরাদ্দ মোট বাজেটের ১৩ দশমিক ১ শতাংশ থেকে কমে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১১ দশমিক ৬ শতাংশ হয়। জিডিপির অনুপাতে বর্তমান অর্থবছরে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ জিডিপির ২ শতাংশ, আগের অর্থবছরে যা ছিল ২ দশমিক ১৬ শতাংশ। আমাদের শিক্ষা খাতের সবচেয়ে বরাদ্দ বেশি ছিল স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে, ২২ শতাংশ। জাতীয় উন্নয়নে শিক্ষা খাতে বিনিয়োগের সুফল আসে ধীরে ধীরে, কিন্তু এ সুফল সুনিশ্চিত এবং দীর্ঘস্থায়ী। অর্থনীতিবিদদের মতে, শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ সবচেয়ে লাভজনক এবং নিরাপদ রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ।

রাষ্ট্রের উচিত বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের জন্য আলাদা করে বৃত্তির ব্যবস্থা করা এবং উচ্চতর স্তরে গবেষণার পর্যাপ্ত সুযোগ আর যথোপযুক্ত কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে তাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিয়োগের ব্যবস্থা করা। শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বাড়াতে প্রতিযোগিতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে। শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ দেওয়া দরকার। ভ্রাম্যমাণ বিজ্ঞানাগার আর একঝাঁক মেধাবী শিক্ষকের সহায়তায় স্কুল-কলেজগুলোতে বিজ্ঞানাগারের অভাব পূরণের পাশাপাশি বিজ্ঞান শিক্ষাকে আনন্দময় করে তোলা সম্ভব। একজন দক্ষ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কয়েকজন শিক্ষার্থী নিয়ে ছোট-বড় বিভিন্ন প্রকল্প পরিচালনা করলে শিক্ষার্থীরা গবেষণার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠবে। মফস্বলের স্কুল-কলেজগুলোতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নানা ধরনের অলিম্পিয়াড, বিজ্ঞানমেলা, বিজ্ঞান বিতর্ক করা যেতে পারে।

লেখক : শিক্ষক, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা